PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-1, May 2021

মুক্তধারা : বাঁধ কেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতি

ড সুফল বিশ্বাস [1*]

[1*] সহযোগী আধ্যাপক , বাংলা বিভাগ, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় ,শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ

'But man, proud man
drest in a little brief authority,
most ignorant of what he's most assured
His glassy essence-like and angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep."১
(Measure for Measure-Shakespeare)

মানুষ জানে সে এক বিশেষ সীমায় বন্দী, সে দেবতা নয়। প্রকৃতির নিগূঢ় প্রবর্তনায় যে সৌন্দর্য, যে শক্তির সুকুমার প্রকাশ সে নিজের শক্তিতে অর্জন করেছে তার উপরে তার অধিষ্ঠান নয়, তার লীলার মধ্যেই তার সকল শক্তি সীমাবদ্ধ। তবু মাঝে মাঝে সে নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ভুলে নিজেকে দেবতার সমগোত্র ভাবার ধৃষ্টতা করে। ক্ষুদ্র শক্তির বিস্ফোরণে সে মনে করে তার মধ্যে আছে বিপুল শক্তির সম্ভাবনা। এই ভ্রান্তি তাঁকে যেমন অস্থির করে তোলে নিয়ত তেমনি নিজের এই অস্থিরতায় সে আশে পাশের মানুষ ও দেবতার সৃষ্টিকেও করে তোলে অস্থির। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থায় এই কারণেই তৈরি হয় অকারণ এক ক্রম অস্থিরতা। যন্ত্রের অস্বাভাবিক কালোধর্মী শক্তিকে ব্যবহার করে সে নিজের শক্তির মত্ততা প্রকাশ করতে অস্থির হয়ে পড়ে। নিজেকে যন্ত্রের সমার্থক করে অন্য মানুষকেও যন্ত্রে পরিণতা করার মানসিকতায় সে এমন বুঁদ হয়ে পড়ে যে প্রেম নয়, প্রবলের প্রতাপে সে নিজের দুর্বল নিরীহ এককেকেই প্রতিস্পর্ধী ভেবে নিষ্ঠুরের মত পীড়ন করে। যন্ত্রের সহায়তায় নিজেকে দেবতা প্রমাণ করার তার এই মানসিকতাই সর্বস্তরে অকারণ অস্থিরতার জন্ম দেয়। 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্র ও জীবনের লড়াই আসলে অস্থির আত্মাহীনের সঙ্গে ক্রম অস্থির হয়ে ওঠা আত্মার লড়াই। মানুষ যন্ত্র বানায়, মানুষের উপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে। যন্ত্র নিয়ে নিজের জীবন শৈলী সাজাতে গিয়ে সে কখন একসময় ভুলে যায় মানুষের আত্মা আছে, যন্ত্রের আত্মা নেই। যার আত্মা নেই তাকে নিয়েই সে আত্মা আছে যার তাকে আয়ত্বে আনতে চায়। এই অসঙ্গত চাহিদায় বিশ্বে আনে অস্থিরতা। যন্ত্রের কল্যাণ শক্তি ভুলে তার অকল্যাণ রূপের এই সাধনা গোটা মানব সভ্যতায় নিয়ত অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে।

চুম্বক শব্দ- বিশ্ব, কল্যান, যন্ত্র, শক্তি, অস্থির ,প্রকৃতি

চেক নাট্যকার Karel Capek' তাঁর সুবিখ্যাত নাটক Rossum's Universal Robots' বাR.U.R তে এই আত্মাহীন যন্ত্র ও আত্মার দ্বন্দ্বই দেখিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর অমর উক্তি আজও আমাদের কানে

বাজে। যন্ত্র ও জীবনের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে নাটকের এক জায়গায় যা উল্লেখিত আছে তা অনেকটা আপ্তবাক্যের মতো,---

'Robots are not people. Mechanically they are more perfect than human beings, they have an enormously developed intelligence; but they have no soul."২

মানব সভ্যতায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দই কাঙ্খিত। তাই যতই প্রচেষ্টা হোক যন্ত্র কখনও জীবনকে আত্মাহীন করতে পারে না। তাই, যন্ত্র-আত্মার লড়াই চলে নিয়ত। আত্মার স্বাভাবিক প্রাণের প্রবাহ বুক চিতিেিয় দাঁড়ায় যন্ত্রের সামনে। প্রাণের বিনিময়ে যন্ত্রের দানবিক শক্তিকে সে প্রতিহত করে কিন্তু যন্ত্রের আত্মাহীন অবয়ব শত চেষ্টাতেও তাকে গ্রাস করতে পারে না। 'মুক্তধারা' নাটকের পরিকল্পনায় এই প্রাণের চির সবুজ শক্তিরই বন্দনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে নাটকের প্রধান চরিত্রের ভূমিকা কি তাও উল্লিখিত আছে নাটকের বিভিন্ন আসাধারণ সংলাপে--- যেখানে প্রাণ ও যন্ত্রের দ্বৈরথে যন্ত্রের হয়েছে পরাজয় প্রাণের হয়েছে জয়।

২১ শে বৈশাখ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে 'মুক্তধারা' নাটকের পরিকল্পনা নিয়ে যা বলেছেন তার মধ্যে আমাদের বক্তব্যের অনেক সত্যতা আছে বলে মনে করি,---

"তোমার চিঠিতে তুমিMachine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই এইMachine নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে অতএব প্রাণ দিয়ে সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে-কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে---তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকে অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে,'আমি মারের উপরে;মার আমাতে এসে পৌঁছয় না-আমি মারকে না লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।' যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে মানুষ আঘাত করছে আত্মাত ট্র্যাজেডি তারই-মুক্তি সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, 'মার লাগিয়ে জয়ী হব'। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, 'হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।' আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, 'প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে। যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয় আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ...।"৩

বিশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন গোটা পৃথিবী বিশেষ করে ইউরোপ একটা বিরাট অস্থিরতার সম্মুখীন হতে চলেছে। তার এ অস্থিরতা ক্রমে গ্রাস করবে গোটা পৃথিবীকে এই সত্য তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিত্য নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ও তার অফুরাণ শক্তির প্রকাশে চমকিত এক শ্রেণীর মানুষ অন্য মানুষকে তাদের বশে এনে নিজের শক্তির প্রমত্ততা বোঝানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। গোটা ইউরোপ জুড়ে তৈরি হওয়া নানা শক্তির ভরকেন্দ্র একে-অপরের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার তাগিদে একটি গোটা বিশ্বযুদ্ধের জন্ম

দেয়। কবির সারা জীবনের ললিত বিশ্বাসবোধে নেমে আসে এক দারুণ আঘাত। স্বার্থের সঙ্গে স্বর্থের দ্বন্দ্ব আর নিজের তীব্র কলকূট অপরের শরীরে প্রবেশ করানোর অস্থিরতায় সদা কম্পমান। এই ইউরোপে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যন্ত্র আর মানবতার দ্বন্দ্ব। কয়েক দশক যন্ত্র আর মানুষের এই অসম লড়াইয়ে মানুষকে নির্মম ভাবে পরাহত হতে দেখে কবির হৃদয় প্রতি নিয়ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কলমের নিয়ত প্রতিবাদে তিনি অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি শান্তিকামী মানুষকে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানান। কারণ প্রেম ছাড়া প্রবলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার শান্তিকামী মানুষের আর নেই। কবি এই বিশ্বাসবোধে আজীবন অটল ছিলেন যে, সভ্যতায় অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রের প্রতাপ আর এক অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। 'মুক্তধারা'র প্রতি পরতে পরতে মানব সাধারণের যে প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা আছে সেখানেও মারের বদলে মার নয় বরঞ্চ প্রবলের মারের কাছে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অধিকার অর্জনের সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা, নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদ, জাতিয়তাবোধের বোধহীন ব্যাখ্যায় মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে করা অত্যাচার, এক দেশের অন্যদেশকে শোষণের জন্য নারকীয় ধ্বংস সবই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রবলের দুর্বল শোষণ, তার নানা অছিলায় চাপিয়ে দেওয়া নানা ধরণের অত্যাচার, সবল রাষ্ট্রের দুর্বল রাষ্ট্রকে নানা কায়দায় বিপদে ফেলার নানা ঘৃণ্য রাজনীতি রবীন্দ্রনাথকে প্রতিনিয়ত নানা যন্ত্রণা দিত। এই যন্ত্রণাই আসলে 'মুক্তধারা' জন্মের জন্য দায়ী। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মতো যন্ত্র-মানবের দ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অন্য এক রাজনীতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি- এক বৃহৎ মানব একককে, এক প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ফেলে শক্তিশালী মানব গোষ্ঠীর শক্তির প্রমত্ততাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেখানে ১৯২২ সালে বসে তিনি অনুভব করেছিলেন নদী যাকে কোনো রাষ্ট্রের বা মহাদেশের জীবন রেখা বলা হয় তাকে নিয়েই আগামী বিশ্বের অন্য এক রাজনীতি-ক্রম অস্থির এক রাজনীতির জন্ম হবে, যার প্রভাব পড়বে প্রকৃতির বর্ণিল প্রবর্তনায়, প্রভাব পড়বে জাতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন শৈলীতে। ক্রম অস্থির আর এক বিশ্বের জন্ম হবে, যেখানে আবার জন্ম নিতে হবে অভিজিৎদের, মৃত্যুও বরণ করতে হবে যন্ত্রের ভীষণ উদ্দামতা জয় করে মুক্ত---ধারাকে পুণঃমুক্ত করতে।

'নদীবাঁধ'---স্বততঃ বহমান স্থল পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রীক-আন্তঃরাষ্ট্রীক জীবন রেখার সাবলীল প্রকাশের গতিনাশের এক অমোঘ প্রচেষ্টা। যার অভিঘাতে রাষ্ট্রীক ও আন্তঃরাষ্ট্রীক জীবন ছন্দে আসে এক অকারণ তৈরি করা অস্থিরতা। সবল রাষ্ট্র, দুর্বল রাষ্ট্রকে বশে রাখার কৌশলে কখনও ব্যবহার করে এই স্থবির জড় বাস্তু শিল্প, আবার রাষ্ট্রও কখনো নিজেরই সুস্থির জনসমাজে এই বাঁধের দ্বারাইতৈরি করে অকারণ অস্থিরতা। বহুযুগ ধরে চলে আসা নদীকেন্দ্রিক জীবন ছন্দে এই অকারণ প্রহারে আসে স্থানিক পরিচয়হীনতা। নিজের দেশেই বেশ কিছু পরিচয়হীন জাতি রাষ্ট্রের দেওয়া এই অস্থির জীবনের প্রকাশে রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র নির্মম ভাবে দন্ডও দেয় কিন্তু সেই দন্ডের অভিঘাতও অনেক সময় রাষ্ট্রকেও বেসামাল করে দেয়।

আধুনিক সভ্যতায় গতিই বড় কথা। আধুনিক বিশ্বকে আরো আধুনিক ও আরো উন্নত করার স্বপ্নে বিভোর রাষ্ট্র জলশক্তিকে ব্যবহারের কল্যাণমুখী স্বপ্ন দেখিয়ে যে নদীবাঁধ নির্মাণ করেছে তা কতখানি

কল্যাণ করেছে বা তাতে প্রকৃতি ও মানুষের চিরন্তন স্বাভাবিক সম্পর্কের কতখানি ক্ষতি করেছে, সে বিচার করতে গিয়ে নদীবাঁধের স্বপক্ষে প্রতিষ্ঠিত নানা যুক্তি আজকের অভিজ্ঞানে খুব সুখের নয়। বহু দেশে বড়মুখ করে নদী বাঁধের উদ্বোধনে অনেকের চওড়া হাসি আর গর্বভরা বুক পরবর্তীকালে বেদনাঘন অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে ভাকরা নাঙাল বাঁধের প্রতিষ্ঠায় নেহেরু বেশ জাঁক করে আত্মতৃপ্ত হয়ে বলেছিলেন,---

'...It has become the symbol of a nation's will to march forward with strength; determination and courage...As I walked around the site I thought that these days the biggest temple and mosque and gurdwara is the place where man works for the good of mankind. which place can be greater than this. This is Vhakra Nangal. where thousands and lakhs of men have worked. have shed their blood and sweat and laid down their lives as well?"৪

কিন্তু ভুল ভাঙতে তার দেরি হয়নি। মাত্র চার বছরেই তিনি বুঝেছিলেন নদীবাঁধের পরবর্তী কুপ্রভাবের কথা---সুদূর প্রসারী ব্যাপক প্রভাবের কথা। ১৯৫৮ সালে তাঁর এক মন্তব্যে এ বিষয়ে আক্ষেপের সুর শোনা যায়,---

'I have been beginning to think that we are suffering from what we may call disease of giganticism...We want to show that we can build big dams and do big things but the Idea of having big undertakings and doing big tasks for the sake of showing that we can do big things is not a good outlook at all.৫

নদী ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তার উপরেই নদী বাঁধ সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশে নদীর যে ভূমিকা তাকে জোর করে বশে আনতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকেই বেশি উপেক্ষা করেছে। যারা দরিদ্র রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন, বা যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কম ক্ষমতাশালী তাদেরকেই নদী বাঁধের অস্ত্রে আরো শির নত করতে বাধ্য করার চেষ্টা চলেছে গোটা পৃথিবী জুড়েই। অতি সামান্য লাভের অঙ্কে বহু মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে স্থানিক পরিচয়হীনতায়। নদীবাঁধের কারণে কখনও নদী কেন্দ্রিক বহু মানবজাতি একেবারে হারিয়ে গেছে আবার কখনও নদীর প্রবল শক্তির কাছে পরাভূত ভেঙে পড়া বাঁধের কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। অসংখ্য মৃত্যু ও স্বজন হারানোর বেদনায় অনেক ক্ষেত্রে নানা জনজাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে না অস্থিরতা যা রাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কেও বহু ধরণের প্রভাব ফেলেছে।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বহু নদী এবং নদীকেন্দ্রিক জনপদ তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে আমাদের দেওয়া বাঁধের কল্যাণে। বাংলাদেশের চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের অহংকারে আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুভূতির কথা, লোক সমাজের কথা। তাদের মধ্যে নিয়ত জন্ম নেওয়া নানা অস্থিরতার জন্য আমরা কিন্তু নিজেকে দায়ী করতেই পারি। রাজনৈতিকভাবে আমরা এই বাঁধ নিয়ে এক দেওয়া নেওয়া রাজনীতির জন্ম দিয়েছি। তাতে এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ত জন্ম

নেওয়া উষ্মার কথা ভুলে গিয়েছি। এক ছোটো দেশের নদীকেন্দ্রিক দারুন আবেগ কিভাবে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের উপরেও এই রাজনীতির কি প্রভাব তা জেনেও আমরা সমাধানে প্রবৃত্ত হচ্ছিনা। আসলে দেওয়া-নেওয়া রাজনীতির ঘোলাজলে প্রকৃতি ও মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে একেবারে চোখবন্ধ করে। এটা আসলে এক শক্তিশালীর সেই শক্তির রূপকল্প যা দুর্বলকে ইচ্ছামত বশে আনার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নান্দনিক শিল্প যা হিসেব করে নানা অঙ্কের চুলচেরা বিশ্লেষণে নানাভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই এশিয়াতেই আমাদের চেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র চীনও ব্রহ্মপুত্র নদকে নিয়ন্ত্রণ করে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে আমাদের জীবন রেখা গঙ্গা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার। যার মধ্য দিয়ে সেই একই রাজনীতির জন্ম তারা দিতে চাইছে, একই দেওয়া নেওয়া রাজনীতির লাভ-লোকসানের অঙ্কে। সেখানে অসংখ্য জনজাতির আবেগের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিতে চাইছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল অঙ্ক।

তাই বাঁধ যখন একটা জাতি গর্বের প্রতীক, তাদের পূজার সামগ্রী, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংগীত,---

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র ।
তুমি চক্রমূখর মন্দিত
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস বিকট দন্ত
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবজয় পন্থ।
তব লৌহ গলন, শৈল দলন
অচল-চলন মন্ত্র
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকির্ণ অস্ত্র
তব পঞ্চভূত বন্ধন কর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"৬

অন্য জাতির কাছে তা স্বজন হারানোর বেদনার সংগীত। বাঁধের কারণে নিজের স্বজন হারানো বেদনায় অস্থির আর্তের হাহাশ্বাস। অসংখ্য মা অম্বা তাদের সুমনকে তাদের সন্তানকে খুঁজে ফেরে বাঁধের রাজনীতির কারণে। জনে জনে ডেকে সে জানতে চায় তার সন্তানের আগমন সংবাদ। রাষ্ট্রের লাভ ক্ষতির কুটিল অঙ্কে কত অজস্র সুমন যে হারিয়ে যায় তার খোঁজ কে রাখে। গোটা বিশ্বে বহু সুমন আগামী কালের নদী বাঁধের রাজনীতিতে হারিয়ে যাবে---আধুনিক সভ্যতার কূটনৈতিক অঙ্কে এদের হারিয়ে যাওয়ার সত্য নাট্যকারের কলমে ধরা পড়েছে একেবারে ধ্রুব সত্য হয়ে,-

স্ত্রীলোক ।। সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা, আমার সুমন এখনো ফিরলো না। তোমারা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক।। কে তুমি?

স্ত্রীলোক ।। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিঃশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক।। তার কি হয়েছে বাছা?

অম্বা।। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম-ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

নাগরিক।। তাহলে মুক্তধারা বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা।। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরী শিখরের পশ্চিমে-সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারপরে আর পথ দেখতে পাইনে।

নাগরিক।। কেঁদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড় দিন, তুমিও চলো।

অম্বা।। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখ, আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁচচ্ছেনা-পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক।। কে নিচ্ছে?

অম্বা।। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন।”৭

অম্বা এখানে আসলে প্রতীক মাত্র। এখানে আমরা সুমনকেও প্রকৃতি ও মানুষের ললিত সত্তাও বলতে পারি আবার বাঁধের রাজনীতির জন্য বলি প্রদত্ত মানব একক ও বলতে পারি। তবে যাই বলি না কেন, এটা আসলে শাসকের হাতে তৈরি শাসিতের করুণ ট্রাজেডি। যা নদীবাঁধ কেন্দ্রিক রাজনীতির এক অমোঘ পরিণতি।

রাষ্ট্রের মানুষকে অনেক সময় বশে আনতে বা নিজের অস্থির চিত্তের বিক্ষোভের প্রশমন ঘটাতে রাষ্ট্র অনেক সময় রাষ্ট্রীক সন্ত্রাস নামিয়ে আনে নির্লজ্জভাবে। সেখানে তার শক্তি প্রদর্শন আসলে তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের শর্ত পূরণের লক্ষ্য। তার জন্য মৃত্যুকে নাম দেয় বলিদান, নিজের শক্তির মদগর্বকে বলে বিজ্ঞানের জয়তিলক। তার কাছে কান্না আসলে নিরর্থক কতগুলো সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব। অজস্র অভিশাপ তার কাছে আসলে তার জয়ের স্মারক। যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রীর পরামর্শে নিজের সীমিত শক্তিকে বাড়িয়ে সে যে আলাদা সে যে সমস্ত যুক্তির শেষ কথা সেটা প্রমাণ করতে আসরে নেমে পড়ে। তার

ভেতরের কথা তখন বসে যায় তার বেতনভুক শিক্ষকের কণ্ঠে ,যন্ত্রীর কণ্ঠে, প্রসাদ প্রার্থী যুক্তিবাদী তার্কিকের নানা কূট তর্কে। অসংখ্য মৃত্যু, বঁধের তোড়ে ভেসে যাওয়া আশা-নিরাশা তাড়িত অস্থির জীবন তার কাছে মূল্যহীন মূল্যমানে মেপে নেওয়া কতগুলো প্রত্যয়, বিভূতি ও দূতের কথোপকথনে শাসকের অন্তরের এই যান্ত্রিক অভিব্যক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। একটু দীর্ঘ হলেও যা উল্লেখ করার মত,---

বিভূতি ।। কী তাঁর আদেশ?

দূত।। এত কাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝর্ণাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বার বার ভেঙে গেল, কত লোক ধূলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে---

বিভূতি ।। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয়নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত।। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এখবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি ।। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত।। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত---

বিভূতি।। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত।। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি।। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত।। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয়নি?

বিভূতি।। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত।। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি।। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত।। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি।। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চন্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো

বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত।। যুবরাজ বলেছেন, কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরো বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি।। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত।। যুবরাজ বলেছেন, ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি।। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত।। তিনি বলেন উত্তরকূট কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি।। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো, আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখিনি।''৮

'প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে'---যন্ত্রের সহায়তায় শাসকের এই অন্তরের কথাটই আসলে সত্য। আধুনিক বাঁধ কেন্দ্রিক রাজনীতির এটাই আসল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাপকাঠি, দেওয়া-নেওয়া রাজনীতির অঙ্ক। এখানে যান্ত্রিক হৃদয়ের সঙ্গে যন্ত্রেরই সখ্য, ঝর্ণার মতো মানব হৃদয়ের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। এই পরিচয় হীনতাই বিশ্ব অস্থিরতার এক অন্য শিকড়ের সন্ধান দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

অবাধ্য জনসাধারণকে শাসনের উদ্দেশ্যে শাসক শক্তির গর্বে মানুষের জীবনরেখার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। রূপকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকূট বা শিবতরাই প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন। এখানে শিবতরাই রাষ্ট্রের মধ্যে তৈরি হওয়া সমান্তরাল শক্তিস্থান, শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা শাসিত দূর্বল রাষ্ট্র, অবাধ্য কোন এলাকা, প্রভৃতি যোকোন এক বা একাধিক স্থানের প্রতীক। আর উত্তরকূট প্রবলের প্রতাপের সেই প্রতীক। যার কাছে যন্ত্র আর তার সাহায্যে প্রাপ্ত শক্তির মদমত্ততাই আসল কথা, হৃদয়ের বাণীর চেয়ে লাভালাভের কূট অঙ্কই প্রধান।

অতি উগ্র রাষ্ট্রনীতি, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের মূঢ় শিক্ষাব্যবস্থা, যান্ত্রিকতার নামে নিজেকে ও অপরকে প্রবঞ্চনা, দখলদারী মানসিকতার আগ্রাসী মনোভাব, বিজ্ঞানের কালোশক্তির ব্যবহার, হৃদয়ের থেকে বড়ো করে দেখা পেশীশক্তি প্রভৃতি যা সভ্যতার কালোদিকের প্রকাশ এবং যাদের প্রবর্তনায় শুধু অস্থিরতাই

জন্ম হতে পারে তার স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে বসেই চালচিত্রের আকারে আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। এক অদ্ভুত 'পোড়ো জমিতে' বসে তিনি সর্বাঙ নাস্তির মধ্যে মানুষকে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে দেখেছিলেন। কিন্তু সর্বাঙ নাস্তির মধ্যে থেকেও না---এর জগতে লীন হননি। সাধারণ মানুষের মার খেতে খেতে প্রতিবাদের প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি নাস্তির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা দেখেছিলেন। তার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই এই বেরিয়ে আসার রাস্তা আছে। আলোচ্য নাটকের পরিকল্পনাতেও তিনি কালোও আলোশক্তির লড়াই এ আলোশক্তির জয় দেখেছিলেন। রূপক প্রতীকের আড়ালে তিনি অস্থিরতার বিপরীতে সুস্থিরতার ভারসাম্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

'মুক্তধারা' নাটকের সূচনায় যে প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সেখানেও কালো ও আলোর দ্যোতনা আছে। একদিকে আছে আকাশভেদী বাঁধের মাংসহীন ভীষণ করাল বদন অন্যদিকে আছে ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূল। এই দুই এর মাঝখানে আছে পথ। গোটা নাটকের প্রতি পরতে পরতে এই তিন প্রতীকের নানান ব্যাখ্যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বারে বারে। প্রাণহীন যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের সংঘাত নাটকটিকে অনন্যতা দান করেছে। যন্ত্রের ব্যবহারে শাসক কিভাবে শাসক-শাসিতের প্রাণের স্বাভাবিক প্রবাহকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করেছে এবং প্রাণ কিভাবে মৃত্যুর অঞ্জলিতে তা প্রতিহত করেছে তা বিভিন্ন চরিত্রে বর্ণিল উপস্থাপনায় প্রমাণ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক শাসনের চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনীই 'মুক্তধারা'।

রাষ্ট্রীক সন্ত্রাস রাষ্ট্র একা করতে পারে না। সে তার আশেপাশের ক্ষমতার বৃত্তে সবসময় নিজের মতো করে একটা কৃত্রিম জগৎ বানিয়ে নেয়। সেখানে তার মতো করে এলিট শ্রেণী, শিক্ষাব্যবস্থা, অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের জন্য সংস্কৃতি বলয় তৈরি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সবসময় নিজে শ্রেষ্ঠ অপরে তার তুলনায় শিক্ষা সংস্কৃতিতে ছোট, এই তথ্য তার আশপাশের ভবিষ্যতের নাগরিকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তোতাকাহিনীর মতো এক অসুস্থ নাগরিক সমাজ বলয় সে তৈরি করে। তারা যেমন নিজেও মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ অস্থির তেমনি তাদের ছোঁয়ায় অন্য সংস্কৃতিবলয়ও একটু একটু করে অস্থির হয়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসও যে আগামী বিশ্বের অস্থিরতার প্রধান উপকরণ হতে পারে সেই ভয়ংকর সত্যও অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তধারা' নাটকের উত্তরকূটের ছাত্র-শিক্ষক পাঠদানের চিত্রে তার চকিত ভাস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আমি কেন কিভাবে দূর্বল রাষ্ট্রকে আমার বশে নেব সেই তথ্য এই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের রাংতার মোড়কে উপস্থাপন করে। ধূর্ত বর্ণিকের তুলিতে একটু একটু করে এই রূপরেখা নির্মিত হয়। বর্তমান বিশ্বে এই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস কিন্তু বুলেটের চেয়েও বড়, কূটনৈতিক দৌত্যের চেয়েও অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী,---

গুরু।। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ।। জয় রাজরা---

গুরু।। (হাতের কাছে দুই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া) জেশ্বর।

ছাত্রগণ।। জেশ্বর।

গুরু।। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ---

ছাত্রগণ।। শ্রী শ্রী শ্রী ---

গুরু।। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ।। পাঁচবার।

গুরু।। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ---

ছাত্রগণ।। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী ---

গুরু।। উত্তরকূটাধিপতির জয় ---

ছাত্র ।। উত্তরকূটা ---

গুরু।। ধিপতির

ছাত্রগণ।। জয়।

রণজিৎ।। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু।। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাইনে।

রণজিৎ।। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা।। (লাফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ।। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা।। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ।। কেন খারাপ?

রণজিৎ।। কেন খারাপ জান না?

গুরু ।। জানে বৈকি? কি রো তোরা পড়িসনি? বইয়ে পড়িসনি? ওদের ধর্ম খারাপ।

গুরু।। আর ওরা আমাদের মতো---কি বল্ না (নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা।। নাক উঁচু নয়।

গুরু।। নাক উঁচু থাকলে কি হয়?

ছেলেরা।। খুব বড়ো জাত হয়।”৯

এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি করে দেয় সুস্থ সংস্কৃতি,শিক্ষা, শীলিত চেতনা---এই পার্থক্য কোন এক মানুষকে আর এক মানুষ থেকে চোখে পড়ার মতো পার্থক্য বা আলাদা করে দেয় না। এই পার্থক্য এক মানুষ আর এক মানুষের থেকে শিক্ষার সামগ্রী জোগায়। সুস্থ স্বাভাবিক অভিযোজনে এই পার্থক্য আর নিঃশব্দ সুস্থ প্রতিযোগিতাই সভ্যতাকে উৎকর্ষের শীর্ষে নিয়ে যায়। কিন্তু এক মানুষকে আর এক মানুষ থেকে যদি পার্থক্য করে দেয় 'পাওয়ার' বা শক্তি এবং তা যদি একে অন্যকে মানবেতর প্রাণীতে রূপান্তরের বাসনায় যন্ত্রের দানবিক শক্তির সহায়তা নেয় তাহলে সভ্যতায় তৈরি হয় এক ভয়ংকর অস্থিরতা। কিন্তু অস্থিরতা যতই প্রবল হোক, যতই দীর্ঘমেয়াদী আর ছোট ছোট বৃত্তের অস্থিরতা সৃষ্টি করুক না কেন সে-ই শেষ কথা বলে না। তার প্রতিরোধে সুস্থ স্বাভাবিক সুস্থির চিন্তা একদিন না একদিন জন্ম নেবেই। সঠিক অস্থিরতা সৃষ্টিকারী যান্ত্রিক সত্তার রাঙা চোখের দিকে তাকিয়ে সে নিজের সুস্থির প্রজ্ঞা প্রকাশ করবেই---এই সত্য 'মুক্তধারা'য় যন্ত্র ও প্রাণের দ্বন্দ্বে বারবার প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বৈব মিথ্যের জালে বন্দী মেকী যান্ত্রিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্য কথার প্রকাশ স্বাভাবিক, সাবলীল,---

উদ্ধব।। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ?

অভিজিৎ।। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব।। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ।। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায়
বাঁচানো যায় না। তাই,ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে
দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারিনে।

উদ্ধব।। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি
উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ।। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে
উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব।। দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন, এর বেশি
আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও।
পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।"১০

শাসক রণজিৎ এর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের কথোককথনেও প্রকাশ পেয়েছে এই একই সত্য,---

রণজিৎ।। পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়।। না মহারাজ দেব না।

রণজিৎ।। দেবে না! এতো বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়।। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ।। আমার নয়?

ধনঞ্জয়।। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ।। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়।। ওরা ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমিবারণ করে বলি-প্রাণ
দিবি তাকেই প্রাণ দিয়েছেন তিনি।১১

মানব যন্ত্রের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রাণের এই সাহসী প্রত্যয়ই অস্থিরতার বিরুদ্ধে সুস্থিরতার অস্ত্র। 'মুক্তধারা' নাটকে বিশ্ব সভ্যতার এক বড় সমস্যা থেকে উত্তরণে চাবিকাঠি এখানে আছে বলেই আমার মনে হয়। যা আসলে যন্ত্র নির্ভর অস্থিরতার বিরুদ্ধে প্রাণের প্রতিরোধের এক নির্ভরযোগ্য গ্রহনীয় সূত্র। যা আজকের বিশ্বের কাছে বেশি জরুরী।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১ Measure for Measure - Shakespeare.Foundation Book, N.Delhi, 1996.

২ Rossum's Universal Robots -Karel Capek.

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩২-৩৩।

৪ Speechs Vol-III. March 1953 Aug pgs 57, Publication Division Govt. Of India 1958.

৫ Irrigation & Power, Vol-XVI, No-1, Jan 1959.

৬. মুক্তধারা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭. মুক্তধারা, ঐ।

৮.মুক্তধারা, ঐ।

৯. মুক্তধারা, ঐ।

১০. মুক্তধারা, ঐ।

১১. মুক্তধারা, ঐ।